৭। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে মহাকবি মধুসূদনের ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা কর।

কাশীরাম দাসকে অভিনন্দিত করে একটি সনেটে মধুসূদন বলেছিলেন —

কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন!)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন;
সেইরূপে ভাষাপথ খননি স্ববলে,
ভারতরসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে।

— এরমধ্যে আত্মকথন আছে। ভগীরথের মত দুষ্কর তপস্যা তাঁর, কাশীরাম দাসের মত নব্যবঙ্গের রস-তৃষ্ণা তিনি নিবৃত্ত করেছেন, তবে শুধু ভারতরসের স্রোত দিয়ে নয়, বিশ্বসাহিত্যের সুধাধারাকে তিনি আমন্ত্রিত করেছেন বাংলা কাব্যের শুষ্কপ্রায় শীর্ণ নদীতে। বহুভাষায় অভিজ্ঞ মধুসূদন ইউরোপীয় কবিদের কাব্যসাহিত্য মন্থন করে বাংলা সাহিত্যে নব প্রাণধারা সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় "I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil, Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton.' মধুসূদন বলেছেন, দৈবশক্তির সমর্থন থাকলে এই কবিকুলগুরুরা কোন ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করতে পারেন। অন্তত এটুকু সুনিশ্চিত সত্য যে, এঁদের সহবাস অবশ্য তোমার কাব্যসাহিত্যে নবযুগ আনতে পারে; বাংলা কবিতায় তাই হল। রাতারাতি মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলে বাংলা কাব্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করল। নূতন ভাবভাবনায় যেমন তিনি বাংলা কাব্যকে দীক্ষিত করলেন, তেমনি নবীন রূপচেতনাকে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলা কবিতার প্রাঙ্গনে।

মধুসূদনের কবিকৃতি বিচিত্রমুখী হলেও প্রধানত তিনি মহাকাব্যের রচয়িতারূপেই খ্যাত। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁর ভাবগত, বিষয়গত, আঙ্গিকগত দান অপরিমেয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Captive Ladie এবং 'Visions of The Past' নামক কাব্যদ্বয় রচনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজী ভাষার পরিবর্তে তিনি বাংলা ভাষায় কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করলে সাহিত্যের প্রাঙ্গন অপূর্ব আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তিনি একটি যুগের বাণীকে অপূর্ব ছন্দে হিল্লোলিত করে তুললেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবন ও প্রয়োগে, পাশ্চাত্য ক্লাসিকের আদর্শে মহাকাব্য রচনার প্রয়াসে মধুসূদনের কবিকৃতির অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশিত হল। তিনি নতুন আঙ্গিকে অভিনব 'পত্রকাব্য' রচনা করলেন। সঙ্গীতমুখর বিচিত্র ছন্দে 'ব্রজাঙ্গনা'-য় রাধার মর্মকথা প্রকাশ করলেন, সংহত ছন্দবন্ধনায় সনেট রচনা করে নিজের জীবনের মর্মকথা উন্মোচিত করলেন। আঙ্গিক-বৈচিত্র্য, ছন্দ-অলঙ্কারের অভিনবত্বে এবং ভাবকল্পনার বিস্ময়কর নতুনত্বে প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তি স্ফুরিত করে তিনি বাংলা কাব্যধারায় ভাব-সম্পত্তির ঐশ্বর্যভরণ আনয়ন করেছিলেন।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি বাংলা কাব্যে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবদান। মধুসূদন এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করে

Scanned by TapScanner

ছন্দের আড়ষ্টতা থেকে বাংলা কবিতার মুক্তি ঘটালেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁর প্রথম কাব্য 'তিলোত্তমাসম্ভব' ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়। একমাত্র 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১) বাদ দিলে তাঁর আর সমস্ত কাব্যই অমিত্রাক্ষর রীতিতে রচিত। 'মেঘনাদবধ কাব্য' (১৮৬১) ও বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) ও পুরোপুরি অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা। এই হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে 'তিলোত্তমা সম্ভব' থেকে চতুর্দশপদী কবিতাবলীর রচনাকাল মাত্র ছয় বৎসর, তাঁর প্রতিভা এই ছয় বৎসরের মধ্যে বাংলা কাব্যকে যা কিছু দেবার দিয়ে গেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতির এমন অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তন এবং তারই সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘকাললালিত সংস্কারের সম্পূর্ণ রূপান্তর—এ তাঁর বিস্ময়কর কৃতিত্বই বটে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য: ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভব' নামে প্রথম মহাকাব্য রচনা করেন। অবশ্য তিনি নিজে তিলোত্তমা সম্ভবকে Epicling বলেছিলেন। মিল্টনের অনুসরণে পাশ্চাত্য ক্লাসিকের আদর্শে মহাভারতের কাহিনী অংশ অবলম্বনে কাব্যখানি লেখেন, কাহিনীটি সামান্য, মূলের সঙ্গে কবির বিশেষ কোন বিভেদতাও গল্পাংশে প্রকাশ পায়নি, প্রথম সর্গে রাজ্যচ্যুত হিমাচলস্থ ইন্দ্রের নিরানন্দের নানা চেষ্টা, অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তাঁর মিলন, দ্বিতীয় সর্গে ব্রহ্মলোকের বহির্ভাগে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুনর্মিলন এবং স্বর্গোদ্ধারের জন্য নানা পরামর্শ, তৃতীয় সর্গে
*বহির্ভাগে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুনর্মিলন এবং স্বর্গোদ্ধারের জন্য নানা-পরামর্শ] তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মার সঙ্গে ঋষিগণাদির সাক্ষাৎ ও সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে শত্রুতা আনবার জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিলোত্তমাসৃষ্টি; চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার রূপদর্শনে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব ও বিনাশ, যদিও কাহিনী নির্মাণে কবি যথেষ্ট দক্ষতা দেখাননি, তবুও যুরোপীয় কাব্যপাঠের সংস্কার চেতনার মধ্য থেকে এই জাতীয় সম্পূর্ণতামত গল্পগঠনে কবিকে সাহায্য করেছে, কোনো অসামঞ্জস্যে তাঁকে দিগ্‌ভ্রান্ত করেনি। এই কাব্যে তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ না পেলেও এই কাব্যে তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে কবির যে সৌন্দর্য চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যমূল্য আছে। তিলোত্তমা প্রাকৃতিক জগতের তিল উত্তমের সমন্বয়েই মাত্র গঠিত নয়, যে প্রকৃতি-জগতের প্রাণ নির্যাস, পৃথিবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বস্তুশোভায় তারই সৌন্দর্য যেন বিকীর্ণ হয়ে আছে। আসলে তিলোত্তমার কল্পনা ও তার রূপায়ণই এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তার সজ্জাতে পৃথিবীতে যে প্রেম জাগাচ্ছে। তার পলকপাতে প্রকৃতির বস্তুনিচয়ে যে সৌন্দর্যের তরঙ্গোদ্বেলতা, যে সম্বন্ধে যেন তিলোত্তমার নিজের চেতনামাত্র নেই। তারই রূপে মুগ্ধ সুন্দ-উপসুন্দ দুজনেই যে সংগ্রামে নিহত, এতে তার চেতনাবোধ নেই, নেই আনন্দোচ্ছ্বাসও। তিলোত্তমার এই কল্পনার মূলে যুরোপীয় রোমান্টিক কবিকুলের ভাবাদর্শ যে অনেকখানি কার্যকর হয়েছে তাতে সন্দেহ করা চলে না। যদিও এই কাব্যে রূপসিদ্ধি ও কাব্য-কলানৈপুণ্যে নানা দুর্বলতা আছে তথাপিও শ্রেষ্ঠ কাব্যের সম্ভাবনার বীজ এই কাব্যেই উপ্ত হয়েছিল।

মেঘনাদবধ কাব্য: 'মেঘনাদবধ' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য। সরলতায়, উল্লাসে ও গাম্ভীর্যে মধুসূদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত। নিখিলের বিস্তারে তাঁর কাব্যগুচ্ছ এতখানি প্রসারিত হয়নি আর কখনও। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি রচিত হবার পর শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে মহাকাব্যের রূপাদর্শ গ্রহণে মধুসূদন অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কাব্যখানি রচিত হবার পর শিক্ষিত বাঙালী সমাজে অভূতপূর্ব আলোড়নও সৃষ্টি হয়। কাহিনী পরিকল্পনায়, চরিত্রসৃষ্টিতে ও ছন্দোবৈচিত্র্যে মহাকাব্যের রূপাদর্শ গ্রহণে মধুসূদন অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় প্রদান করেন। কাহিনীকে কোথাও ডুবিয়ে, কোথাও ভাসিয়ে, কখনও বর্ণনায় ছবিতে রঙে চারিদিকে বিস্তারিত করে, মাঝে মাঝে নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি করে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করে তুলে একটি পরম উপভোগ্য বস্তু গঠন করেছেন মধুসূদন। কোনো কোনো চরিত্রকে সামনে না এনেই গুরুত্ব দিয়েছেন, মূল ঘটনাকে কখনও ঢেকেছেন, কখনও আগে থেকেই ~~শেষ~~ পর্যন্ত সব কিছুই দেখিয়েছেন। সর্বত্রই তাঁর অভিনবত্বের কাব্যকলাবিধি, বিশেষ করে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, সীতা, লক্ষ্মণের চরিত্র সৃষ্টিতে কবি গভীর জীবনানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। বাল্মীকির রামায়ণ হতে কাব্যকাহিনী আহৃত হলেও মধুসূদনের কবিপ্রতিভায় তা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কবিকুল থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মধুসূদন 'মেঘনাদবধ' কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে সর্বাপেক্ষা বড় অভিনবত্ব কবির মানবিকতাবোধ, পরদেশ আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় স্বদেশরক্ষাকারী রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতিই কবির সহানুভূতি পাল্লা ভারী হয়েছে। বিভীষণ ধার্মিক ও পুণ্যাত্মা না হয়েও বিশ্বাসঘাতকরূপেই প্রতিভাত হয়েছে, সর্বোপরি, রাবণের দুর্দম শক্তি কিন্তু নিয়তিলাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির অন্তরের সঙ্গে সহজেই নিজের আত্মীয়তা ঘটিয়েছিল; রাবণ রামায়ণের অন্যতম বীরমাত্র হয়ে থাকেনি, কবি আত্মার প্রতিফলনে সে যেন স্বয়ং মধুসূদনের হয়ে উঠেছে — বিপুল শক্তি, বিপুল কামনা কিন্তু বিপুলতর ব্যর্থতা যে একই সময়ে সকাল এবং চিরকালের মানব। কাহিনী, বর্ণনা, চরিত্রসৃষ্টি সব কিছু ছাপিয়ে একটা বিস্ময়চিহ্ন জিজ্ঞাসা বিশ্ববিধানের তল খুঁজে বেড়ায়, এত কেন ব্যর্থতা, আয়ত্ত সিদ্ধি কেন স্খলিত হয়ে পড়ে, সর্বশক্তি নিয়েও কেন কামনার বস্তুকে ধরে রাখা যায় না? ভারতীয় কর্মফলের দুর্বার ক্রম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি রাবণ, আর পারেনি বলেই তার অতৃপ্তি বিশ্বনীতিকে বিদ্ধ করেছে।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য: 'মেঘনাদবধ' রচনার সমকালেই মধুসূদন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে শ্রীরাধিকার বিরহবেদনা অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা গীতিকাব্য রচনা করেন, ~~এই কাব্যে সর্বাপেক্ষা বড় অভিনবত্ব কবির মানবিকতাবোধ~~, গ্রন্থখানি বৈষ্ণবীয় ভক্তিমূলক কাব্য নয়, মধুসূদনের মতে পাশ্চাত্য Ode জাতীয় কাব্যের মত রোমান্টিক প্রেমের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি এর উদ্দেশ্য। এই কাব্য রচনার পশ্চাতে কবির কোন ধর্মীয় সংস্কার ছিল না। রাধার মধ্যে মানবী সত্তার বিকাশ দেখানোই তাঁর লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতকের মানবিকতাবোধ এই কাব্যটির প্রেরণা। বহিরঙ্গে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব ছিল, ভণিতাও বৈষ্ণব কবিদের অনুরূপ, কিন্তু কবির সৃষ্টিতে রাধা মহাভাব স্বরূপিণী নয়, রাধা এখানে সাধারণ নারী মাত্র 'ব্রজাঙ্গনা' মধুসূদনের লিরিক প্রতিভার অন্যতম নিদর্শন।

বীরাঙ্গনা কাব্য: 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রোমান কবি ওভিদের 'হিরোইডস' বা 'এপিস্টলস অব হিরোইনস'-এর আদর্শে রচিত। কিন্তু জীবনদৃষ্টি, চরিত্রসৃষ্টি ও বাকভঙ্গির মৌলিকতা তার দ্বারা কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি। আঙ্গিক পরিকল্পনায়, বিষয় নির্বাচনে এবং শিল্পসমৃদ্ধিতে মধুসূদনের এই কাব্যখানি অতুলনীয়। এই কাব্যে একুশজন নায়িকার একুশটি প্রেমপত্র ছিল। কিন্তু মধুসূদন এগারোখানি পত্রকাব্য লেখার পরই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন; পত্রগুলি স্বতন্ত্র খণ্ডকাব্য। শকুন্তলা, কেকয়ী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী, জনা প্রভৃতির পত্রে বিচিত্র জীবনের বহু বিচিত্র চিত্র রূপ পেয়েছে। রুক্মিণীর ও সূর্পনখার পত্রের বিষয় কুমারীর প্রেম, স্বতন্ত্রবতী উর্বশীর পত্রে বারাঙ্গনার এবং তারার পত্রে অবৈধ প্রেমের আনন্দবেদনাকে রূপায়িত করেছেন কবি। তবে পত্রাকারে রচিত হলেও এ কাব্যের বাকভঙ্গিতে গীতিধর্ম, নাট্যরস, পৌরাণিক কাহিনী-পটভূমি এবং চরিত্রচিত্রণ অদ্ভুত সমন্বয়ে বদ্ধ হয়েছে। অনেকে একে dramatic monologue বলেছেন। কয়েকটি নারী তাদের স্বামী বা প্রিয়জনকে পত্র লিখেছে। তাদের ভাষায় লিরিক সুর মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেও শব্দ ঝংকারের বিন্যাস এবং মনোভাবের আকস্মিক পরিবর্তনে, কখনও আবার যথার্থ আবেগের দ্রুতিময় ছন্দভাব প্রকাশে — কবি এগুলিকে নাটকীয় করে তুলেছেন, ব্যক্তিগত প্রবণতাকে অনেকটা সংবরণ করে চরিত্র চিত্রণে মধুসূদন বিশেষ সফল হয়েছেন এই কাব্যে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী: মধুসূদনের শেষ কাব্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটগুচ্ছ। পেত্রার্কার অনুসরণে সনেট লিখতে প্রবৃত্ত হলেও কবি সর্বত্র পেত্রার্কার সনেট-আঙ্গিকে স্থির থাকেননি, মিলটনের প্রভাবও তার লেখায় দেখা গেছে। সনেটগুলিতে যে বিষয়গুলিকে কবি অবলম্বন করেছিলেন সেগুলি হল: ১. ভারত তথা বাংলার কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা ২. জাতীয় সংস্কৃতির কথা ৩. ভাষা-ছন্দ-কাব্যরূপ ও রসপ্রসঙ্গ ৪. বিদেশী কবি-পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ৫. প্রেম ৬. নীতি ও ধর্মতত্ত্ব ৭. প্রকৃতি। নানা বিষয় অবলম্বন করে রচিত হলেও সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিপ্রাণের আকুতিই মূলত প্রধান হয়ে ধরা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অবদান অসীম। মাত্র সাত বছর (১৮৫৯ – ১৮৬১) বাংলা কাব্যাঙ্গনে পদচারণা করে তিনি বিস্ময়কর প্রতিভা ও অদ্ভুত সৃজনশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যের ভাব-পরিকল্পনা এবং রূপাঙ্গিক নির্মাণে তিনি অভিনবত্বের স্রষ্টা। এপিকের আদর্শে ওজস্বিনী ভাষায় মহাকাব্য রচনা, পত্রকাব্যের সৃষ্টি, মিত্রাক্ষরে লেখা গীতিকাব্য, সনেট রচনার প্রবর্তন প্রভৃতি সমস্তই বাংলা সাহিত্যে নতুন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের সৃষ্টি এবং ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ব্যবহারে বাণীশিল্পের নূতন আদর্শ স্থাপন মধুসূদনের বিস্ময়কর কৃতিত্ব। তাঁর মতো প্রতিভার উদয় হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালের বাংলা কাব্যের এত দ্রুত উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল, কাব্যের বাকরীতিকে তিনিই সর্বপ্রথম পরিচ্ছন্নতা ও সুগমতা দিয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের বাকরীতির নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বৈচিত্র্য — যা নিয়েই আমরা গর্বিত হই না কেন, তার অগ্রপথিক মধুসূদন এ কথা ভুললে চলবে না।

Scanned by TapScanner